কল্পিত স্মৃতির দিকে তাকিয়ে

তানিম কবির

www.allbdbooks.com

তানিম কবির

জন্ম : ২৫ মার্চ ১৯৮৯

পিতা : আলমগীর কবির

মাতা : জ্যোৎস্না কবির

যোগাযোগ : ০১৭১৭-৫৮৯২৭৪

www.facebook.com/tanimkabir.feni

মুহুরী নদীর ঢেউ থেকে উঠে আসছে নৈঃশব্দ্যের গান, রাত্রির ঘননীল কুয়াশা চিরে ট্রেনের হুইসেল, বহু দূরে... কোথাও বেজে উঠছে পাখিদের অর্কেস্ট্রা আর হাঁসের উন্মত্ত সাঁতারে জলের আর্তনাদ; কয়েক হাজার আলোকবর্ষের পথ পেরিয়ে এইমাত্র পৃথিবীকে ছুঁয়ে দিলো যে নক্ষত্রের আলো, তার মন বলে, এই হলো শব্দ-মুহূর্ত! কবিতার জন্ম-মুহূর্ত! মহাবিশ্বে কবিতার জন্ম, কবির জন্ম, প্রকৃই এক অসামান্য ঘটনা। কেমন ছিলো ওইসব মুহূর্তের ইতিহাস? জানি না। শুধু জানি, ছন্নছাড়া, উন্মুল কবিতাযাপনের দিনগুলি হাতে নিয়ে সমকালের আলপথ ধরে মহাকালের দিকে উঠে গেছে এক মিহিন পথরেখা; রেশমীসুতার মত সূক্ষ্ম সেই পথ। যেতে যেতে বেজে ওঠে স্মৃতির সুরেলা-টংকার। সেই স্মৃতিই আমাদের ভবিষ্যৎ। সত্যের মতো কাল্পনিক কিংবা কল্পনার মতো সত্য। **কল্পিত স্মৃতির দিকে তাকিয়ে** আত্মকথনের ভঙ্গিমায় যখন শব্দ প্রক্ষেপণ করেন, কবি, তানিম কবির; আমাদের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায়,মনে হয়, ব্যক্তিগত আনন্দ-যন্ত্রণার পুরাণ। আরেকটু মনোনিবেশী পাঠ নিতে নিতেই টের পাওয়া যায়, এ হলো আমাদেরই সামগ্রিক জীবনের নীলপদ্ম, আমাদেরই পুরাঘটিত, ঘটমান বা ঘটমান ভবিষ্যতের খেরোখাতা! কেননা, তার কবিতার শব্দাবলী নৈঃশব্দ্যের প্রাণেও বাজিয়ে দেয় তুমুল শব্দ-ঝংকার, ছন্দোহীনতার মধ্যেও গড়ে তোলে নিপুণ ছন্দদোলা, তৈলাক্ত-পিচ্ছিল অন্ধকারেও ঠিকরে দেয় অমেয় আলোকবিচ্ছুরণ। কেননা, জন্ম-মুহূর্তই তাকে দিয়েছে যাবজ্জীবন কবিতা-দণ্ড। তার যাপন মানেই কবিতা যাপন, জীবন মানেই কবিতা-জীবন। কেবল কবিতাই তাকে ঐশ্বর্য দিতে পারে, করতে পারে মহিমান্বিত; জগতের আর সব প্রাপ্তিই তাকে নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর করে তোলার সকল আয়োজন পূর্ণ করে। ফলে, আপাত অসঙ্গতি ও উচ্ছৃঙ্খলতার ভেতরেই তার শব্দাবলীর সংহতি, অভিধানোত্তীর্ণ অর্থ-ব্যঞ্জনার মধ্যেই তার কবিতার সফলতা। অনাথের মতো ব্যাকুলতা নিয়ে জেগে থাকা এইসব কবিতা, ধ্বনি ও শব্দসমবায়... নিরন্তর দাবি করে মমতা ও প্রেম, মহত্তম পাঠকের হৃদয়শাসিত মস্তিষ্ক। এইসব কবিতা পাঠের মধ্য দিয়েই আমরা পেয়ে যেতে পারি, আমাদেরই জীবনের অনাবিষ্কৃত অঢেল উপলব্ধির ঐশ্বর্যমালা। দরকার শুধু **কল্পিত স্মৃতির দিকে তাকিয়ে** আরেকটু মনোযোগ ঢেলে দেয়া, কবিতার প্রতি আরেকটু প্রেমময় মন বাড়িয়ে দেয়া।

রহমান হেনরী
১৪ জুন ২০১১
ঢাকা, বাংলাদেশ।

মুহুরী নদীর ঢেউ থেকে উঠে আসছে নৈঃশব্দ্যের গান, রাত্রির ঘননীল কুয়াশা চিরে ট্রেনের হুইসেল, বহু দূরে... কোথাও বেজে উঠছে পাখিদের অর্কেস্ট্রা আর হাঁসের উন্মত্ত সাঁতারে জলের আর্তনাদ; কয়েক হাজার আলোকবর্ষের পথ পেরিয়ে এইমাত্র পৃথিবীকে ছুঁয়ে দিলো যে নক্ষত্রের আলো, তার মন বলে, এই হলো শব্দ-মুহূর্ত! কবিতার জন্ম-মুহূর্ত! মহাবিশ্বে কবিতার জন্ম, কবির জন্ম, প্রকৃই এক অসামান্য ঘটনা। কেমন ছিলো ওইসব মুহূর্তের ইতিহাস? জানি না। শুধু জানি, ছন্নছাড়া, উন্মুল কবিতাযাপনের দিনগুলি হাতে নিয়ে সমকালের আলপথ ধরে মহাকালের দিকে উঠে গেছে এক মিহিন পথরেখা; রেশমীসুতার মত সূক্ষ্ম সেই পথ। যেতে যেতে বেজে ওঠে স্মৃতির সুরেলা-টংকার। সেই স্মৃতিই আমাদের ভবিষ্যৎ। সত্যের মতো কাল্পনিক কিংবা কল্পনার মতো সত্য। **কল্পিত স্মৃতির দিকে তাকিয়ে** আত্মকথনের ভঙ্গিমায় যখন শব্দ প্রক্ষেপণ করেন, কবি, তানিম কবির; আমাদের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায়,মনে হয়, ব্যক্তিগত আনন্দ-যন্ত্রণার পুরাণ। আরেকটু মনোনিবেশী পাঠ নিতে নিতেই টের পাওয়া যায়, এ হলো আমাদেরই সামগ্রিক জীবনের নীলপদ্ম, আমাদেরই পুরাঘটিত, ঘটমান বা ঘটমান ভবিষ্যতের খেরোখাতা! কেননা, তার কবিতার শব্দাবলী নৈঃশব্দ্যের প্রাণেও বাজিয়ে দেয় তুমুল শব্দ-ঝংকার, ছন্দোহীনতার মধ্যেও গড়ে তোলে নিপুণ ছন্দদোলা, তৈলাক্ত-পিচ্ছিল অন্ধকারেও ঠিকরে দেয় অমেয় আলোকবিচ্ছুরণ। কেননা, জন্ম-মুহূর্তই তাকে দিয়েছে যাবজ্জীবন কবিতা-দণ্ড। তার যাপন মানেই কবিতা যাপন, জীবন মানেই কবিতা-জীবন। কেবল কবিতাই তাকে ঐশ্বর্য দিতে পারে, করতে পারে মহিমান্বিত; জগতের আর সব প্রাপ্তিই তাকে নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর করে তোলার সকল আয়োজন পূর্ণ করে। ফলে, আপাত অসঙ্গতি ও উচ্ছৃঙ্খলতার ভেতরেই তার শব্দাবলীর সংহতি, অভিধানোত্তীর্ণ অর্থ-ব্যঞ্জনার মধ্যেই তার কবিতার সফলতা। অনাথের মতো ব্যাকুলতা নিয়ে জেগে থাকা এইসব কবিতা, ধ্বনি ও শব্দসমবায়... নিরন্তর দাবি করে মমতা ও প্রেম, মহত্তম পাঠকের হৃদয়শাসিত মস্তিষ্ক। এইসব কবিতা পাঠের মধ্য দিয়েই আমরা পেয়ে যেতে পারি, আমাদেরই জীবনের অনাবিষ্কৃত অঢেল উপলব্ধির ঐশ্বর্যমালা। দরকার শুধু **কল্পিত স্মৃতির দিকে তাকিয়ে** আরেকটু মনোযোগ ঢেলে দেয়া, কবিতার প্রতি আরেকটু প্রেমময় মন বাড়িয়ে দেয়া।

রহমান হেনরী
১৪ জুন ২০১১
ঢাকা, বাংলাদেশ।

কল্পিত স্মৃতির দিকে তাকিয়ে

তানিম কবির

কল্পিত স্মৃতির দিকে তাকিয়ে ॥ তানিম কবির
স্বত্ব ॥ লেখক
প্রথম প্রকাশ ॥ জুলাই ২০১১, আষাঢ় ১৪১৮
প্রকাশক ॥ শাবিহ মাহমুদ
উপকূল প্রকাশনী, ৩৪০/৩, কদলগাজী রোড, ফেনী [উপ্র-১২]
প্রচ্ছদ ॥ শুভ্র শাহরিয়ার
অক্ষর স্থাপত্য ॥ সিগনেট প্রিন্টার্স, একাডেমি রোড, ফেনী
মুদ্রক ॥ রাজীব দেবনাথ
সবুজ আর্ট প্রেস, ট্রাংক রোড, ফেনী
মূল্য ॥ ২০ টাকা

Kolpito Sritir Dike Takiye
(A Collection Of Poems By Tanim Kabir)
Published By Sabih Mahmud
Upakul Prokashani, Feni
First Edition : July 2011
Price : 20Tk Only

উৎসর্গ

(কখনও না দেখা মেয়ে প্রত্নকে)

ভাবছি আমার মেয়েটার কথা।
ভালো নাম ছিল না তো তার–
একটাই ডাকনাম
...প্রত্ন।
প্রেমিকার ঘুমন্ত গর্ভে অপলক জেগে আছে সে–
অনেক বছর।
কখনো যাদের চিনবার কথা নয়
তাদের সাথেই আজ দেখা হয়ে যায় তার–
পেটের ভিতর– গাঢ় অন্ধকারে
বারেবারে কারা যেন নামহীন করুণ চোখে
চোখাচোখি করে তার সাথে।
আমার মেয়েকে আমি এখনো দেখি নি
শুধু জানি তার কোন ভালো নাম নেই,
একটাই ছিল তার ডাকনাম–
প্রত্ন...

পরিব্রাজক

কল্পিত স্মৃতির দিকে তাকিয়ে আছি
মিথ্যে রোমন্থনের জলাশয় থেকে খুঁজে আনি
ভিজে যাওয়া ঘুড়ি–
তুড়ি বাজানো শৈশব আমার কেউ ছিলো কি না
জানা নেই। এবং মানা নেই এসব সৃজনপ্রয়াসী
ভাবনার অলিগলিতে হেঁটে বেড়ানোতে–
কেননা, লেবুপাতা আর পুস্কুনির কাদামাটির ঘ্রাণে
বহু ঘুমকে দেখেছি মচমচ শব্দে ভেঙে যেতে।

আরো যারা ছিলো অথবা ছিলো না কোনো কালে
এসব সরব রোমন্থনে তাদেরকে নীরব থাকতে দেখেছি,
সন্ধ্যা নামলে পেয়েছি টের, গভীরে কোথাও সূর্যের উঁকি–
জন্মান্ধ যাপন নিয়ে বহু বহু জীবনের গন্ধ শুঁকি–
কল্পিত স্মৃতির দিকে তাকিয়ে থাকি।

ধুলোঘূর্ণি

আদিগন্ত বিছিয়ে থাকা রেলপথ পরাধীনতার কথা মনে করিয়ে দেয়, মনে হয় দু'শ' বছর প্রতীক্ষা করে ছিলাম স্বাধীনতা নয়– তোমার জন্য। হে আমার প্রেম, তুমি রক্ত আর মাংসের মাঝেই থাকো– অস্পষ্ট চিৎকার হয়ে বারবার স্বপ্নের মধ্যে আঁকো কামনার শিলালিপি। আমি আদ্যোপান্ত ক্লান্ত হয়ে ফিরে এসেছি ঘরে, দূরে ... সরে সরে গেছে দেখো চাঁদ– যেন পৃথিবীর সব প্রতিবাদ লুকোনো তাঁর গোপন অভিমান আর ঘোরের সুতোয়। এই রেলপথ, পাশ ঘেঁষে চলে গেছে আল– আল বেয়ে যেতে যেতে হারিয়ে গেছে কতো আয়ুষ্কাল। সেসব বিলীন হয়ে যাওয়া বয়সের প্রতি মৃদু উপহাস ছিটিয়ে ট্রেনের হাসফাঁস হুইসেল বেজে ওঠে– ইঙ্গিত কুড়িয়ে নেয় কেউ, নিক। দিকবিদিক ঘনায়মান অন্ধকার– কার গন্ধ খুঁজতে যায় আর? হে আমার বিবি হাওয়া, যাওয়া আর আসার চেনা বৃত্তে আটকে আছি মানুষেরা বহুকাল। কেন সঙ্গম, প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে ছড়িয়ে দেয় এতো জন্মচিৎকার? কেন ফাঁদে এতো মৃত্যুর জাল? খোলো চোখ, মেলো চোখ– আসো চোখে চোখে গড়ি সঙ্গম অফুরান; নৈঃশব্দ্যের হাহাকারে আজ গেয়ে ওঠো গান।

বৃত্তার্পিত গান - ১

আসো আর্তনাদে ভরে তুলি সন্ধ্যার আকাশ।

ভাবো তাদের কথা–
শেষ বিকেলেই যারা গুটিয়ে ফেলেছে সমস্ত বাহির।
ফিরে যাবার কথা ছিল আমারও– তুমিও আড়চোখে বিলি কেটেছো
বাড়ি ফেরার ধুলোল পথে।
আর এই আগন্তুক শিল্পবোধ
জীবন-বিচ্ছিন্ন প্রেমের তাঁবু গেড়েছে এখানে,
তাঁবুর নিচে আমাদের স্ববিরোধী দেহগুলো
জড়াজড়ি করে আছে নির্দিষ্ট ঘনিষ্ঠতায়।
অতঃপর গুটিয়ে নেয়া হলে তাঁবুর ওম, বিব্রত ঘাসে
আমরা বুনতে থাকি জীবনের ভুলগুলো শীতার্ত দীর্ঘশ্বাসে।

বৃত্তার্পিত গান - ২

এভাবেই চলে গেল শেষ রাতে আধখাওয়া চাঁদ। আমারো ছিলো কিছু অব্যক্ত কথামালা চাঁদের সাথে, কে হায় বোঝাবে তাকে প্রকৃত প্রেমের মাঝে সবকালে কেউ ঠিকই মাঝপথে এঁকে দেয় বাধ। এভাবেই চলে গেলো শেষ রাতে আধপোড়া চাঁদ। শ্মশানের ঘরটাতে শ্যাওলাতে গতকাল নখ দিয়ে লিখে গেছি অবিরাম কতো কতো নাম, ভুলে যাবো সেইসব জীর্ণ নামের রোদ যদি কেউ নদী পাড়ে হঠাৎ পৌছে গিয়ে বলতো 'এইতো আসিলাম'। চাঁদটাও চলে গেলে এইখানে স্মৃতি ছাড়া আর কেউ বলে না কথা, সময় মানিয়া তবু, চাঁদ ঠিকই চলে যায়, পড়ে থাকি শ্মশানে একা। বহুদিন গড়িয়েছে মৃত্যুর বয়স- মন তবু বলে যায়, অহেতুক সন্ধ্যায়- ফের কি কখনো আর একটা চুমুর ধার, পারবো মেটাতে করে দেখা? চাঁদ ঠিকই চলে যায়- পড়ে থাকি তেমনই একা...

হুইসেলকন্যা

সবগুলো ট্রেন চলে যাচ্ছে- হুইসেলকন্যা কই তুমি?
পাথর-অরণ্য পেরিয়ে জীবন ছুটে যাচ্ছে ভ্রান্ত গন্তব্যে,
আর আত্মহত্যাপ্রবণ মানুষের মিছিল নেমেছে রেলপথে।
রেলপথ,
বেজে ওঠো না কেন?
আমার হৃদয় এক নির্জন ইস্টিশন– ট্রেন থামেনা এখানে,
সন্ধ্যার আর্তনাদ হয়ে তুমি জড়িয়ে রাখো–
প্রিয় হুইসেল, আমার প্রাণে মৃত্যু মাখো তুমি।

জ্বর

কলঙ্কের অলঙ্কারে সাজিয়েছি রাতের জমিন
পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা আমি ছিঁড়ে ছিঁড়ে কুড়িয়েছি
পাপের ভাষা।
সে ভাষায় কথোপকথন গড়ে নাড়িয়েছি
ধুলোভূক বাতাসের অতনু গতর-
হেন-তেন কতো 'কেন' প্রশ্নের চোখ আজ
কেঁপেছিলো– মেপেছিলো আঁধারের উদাসীনতা।

'পিংকহোল' গিলেছিলো আলোর নাচন
তবু কারা মোম জ্বেলে আসে?
ঘ্রাণটুকু খুঁজে নিতে অলীক বাতাসে!
কিছুই পাবে না আহা–
আসো তবু,
দেখে যাও পূণ্য ও পাপে–
আমরা মিলিয়ে গেছি জ্বর-উত্তাপে!

প্রেমান্তমেইল ট্রেন

না-হয় আমায় ফিরিয়ে দিলি ঘ্রাণ শুঁকিয়ে তোর
আমার জন্য অপেক্ষমাণ শীত-কুয়াশার ভোর,
আসতে পথেই ওঁত পেতে রয় চাঁদ-কুটুম্ব রাত
তার নীলেতেই বিছিয়ে দিবো অতৃপ্ত এই হাত।

মাখন-বৃত্ত গোলক ধাঁধায় আটকে থাকা মনটা
তোর বুকে দেখ্ কেমন করে বাজায় কাঁপনঘণ্টা
তাকেও দিবি শূন্যে ছুঁড়ে? দেখি কেমন পারিস-
অদৃশ্য সে; হাওয়ার মতোন ঘুরন্ত বেওয়ারিশ।

শীতের চিঠি

তোর ঐ গভীর চোখের বিষণ্নতায়
আমি এঁকে দিবো বৈরাগ্যের তিলক।
অবসাদের সুতুমুল গহ্বর থেকে
উঠে আসা রাত- হাত বাড়িয়ে ছোঁয়া কোনো
স্বেচ্ছা অনুতাপ আর এসবের
অমীমাংসিত হিসেববহুল খেরোপৃষ্ঠার উল্টোপিঠে
কুয়াশার অক্ষরে লিখে রেখে যাবো-
শীতের চিঠি।
প্রযত্নে ঐ পুরাণগাথা থাকবে তেমন-
আগের মতোন- যেমনি ছিল।
তোর চোখের ঐ ক্লিষ্ট-আবীর
ধুলোয় মেতে একে একে যে যার মতো
ফিরলো শেষে- আমায় শুধু বিরাণ প্রান্ত
অন্তহীন এক প্রতীক্ষাঘোর মন্ত্র দিল
শিখিয়ে।
তবু জানি, রোদনের কোনো নিজস্ব বর্ণমালা নেই,
যেই পথ গেছে অপ্রযোজ্য দাবির মিছিলে-
সেইখানে তুই অচিন বিভূঁই আগের মতোই আছিস
সান্ধ্যডাকে লিখছি তোকে আবার-
তোর মতো তুই যেমন খুশি বিষণ্নতায় বাঁচিস।
আপত্তি নেই...

সন্ধ্যার কোরাস

চির সূর্যাস্ত, তুমি আমায় বুকে নাও,
আমি সন্ধ্যার অরণ্যে হারিয়ে যেতে চাই।
কথোপকথনের তজবি অনেক তো গোনা হলো–
এবার নৈঃশব্দ্যের গহ্বরে সমাহিত করো আমায়।
প্রাচীন বিবমিষায় মজে গ্যাছে মন,
হাত নেড়ে নেড়ে অনেক হলো বিদায়ী শ্লোগান।
চির সূর্যাস্ত
গোধূলির দূরবর্তী হলদে বিষণ্নতায়
এবার আমারে বিলুপ্ত করো তুমি।

ভোরকান্নায়

আমি তো বেচে দিইনি এখনো নিজস্ব সন্ধ্যা,
সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকার আর বন্ধ্যা রাতের
নিরাকার স্বপ্নের অজস্র বুনন।

কতোবার নিজেই নিজের গা বাঁচিয়ে চলেছি
যতোবার সত্যের কিনার ঘেঁষেছি, বলেছি–
সাবধান! মানুষ এখনো নরম তুলতুলে–
ভুল তুলে নেয়ার সময় সে বরাবরই
ফুল তুলে নেয়ার কথা ভেবেছে।
মিথ্যের টোরাকোটায় তাকে নিজের মতো
বাঁচতে দাও– হাসতে দাও আর ভালোবাসতে দাও–
যেন সে ভুলে থাকতে পারে নাম-পরিচয়– আত্মনাশা ভয়।

যে যখন পেরেছে কিনে নিয়েছে– একে দু'য়ে তিনে নিয়েছে
ভাগাভাগি করে, জ্বালিয়েছে চুলা– বসিয়েছে রান্নায়;
এখনো আমার অবিক্রিত আমিটাকে আমি খুঁজে পাই
'নাই' ওড়া ভোরকান্নায়।

বিষণ্ন সন্ধ্যার নামে

আমায় পড়িয়ে দাও ক্ষমার তিলক,
বায়ুর পতাকা উড়িয়ে চলে যাই নৈঃশব্দ্যের কাছে।
আমায় মাড়িয়ে যাও সময়ের স্বর–
পেছন-উন্মুখ করতালির লোভে লোভে রাতভর
স্নায়ুর ভিতর ঘোরে পাতার লাটিম।

মাটির খুব কাছে, সূর্যের আঁচে পুড়ে যাওয়া
আয়নায় সেঁটে আছে এক সুবর্ণ সবুজ টিপ–
সময়ের বিস্মরণ ফেলে গেছে তাকে।
আহা– আমি যাই তার কাছে– হাঁটু গেঁথে বসি
সহস্র বিলীন আয়ুর কোটর থেকে খুঁজে আনি তাকে।

প্রেয়সী প্রেতিনি

প্রেতিনির সঙ্গ ভীষণ অনিবার্য হয়ে উঠলো–
কালো দাঁত, ন্যাড়া মাথা আর অশুভ রক্তের আল্পনায়
যার ওষ্ঠ-অধর– কয়েক শ' চুমু আজ সঁপে দিবো তার
ফাটলাক্রান্ত নখের বাতিল আঙুলে।
তাকে নিয়ে নৌকাভ্রমণ হবে, মাঝপথে মাঝির ঘাড় মটকে
দেবে আমার প্রেয়সী, তার মুখের কাঁচা রক্তের ঘ্রাণ শুঁকে
বুকের গুল্ম-উন্মোচনের নেশায় আমি মাতোয়ারা হবো–
বেরিয়ে এলো তার শুকিয়ে যাওয়া স্তন...
কুঁচকানো চামরায় লাল-পিঁপড়াদের আনাগোনা দেখবো,
এক চুমুকে খেয়ে নিবো লক্ষ-কোটি পিঁপড়ার ব্যস্ততা,
প্রেতিনির আহ্লাদ আমায় ক্রমেই আসক্ত করে তুলবে–
একটা ভূত হয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত আমি তাকে এভাবেই
আদর করে যাবো.. আদর করে যাবো...

দীর্ঘশ্বাসের ওম

দীর্ঘশ্বাসের ওমে নেমে পড়ো কুয়াশায়
বিছিয়ে দিয়েছি বুকের উষ্ণ পশম–
নেমেসিস, তুমি হেঁটে যাও অবলীলায়।
প্রতিহিংসার পক্ষাঘাত রেখে যাও
মেখে দাও হৃদয়ে হাহাকার; অর্ফিয়াসের গান
হয়ে ভেসে যাই অভিশপ্ত নগরীর বিলীনতায়
প্রত্ন-পাথরের ধ্যানের কাছে প্রার্থনায় নত হয়ে আছি
গত পৃথিবীর নিথর নীরবতা ভাঙিয়ে বাজিয়েছি
স্পর্শের কোলাহল; আধো খয়েরি ভোরের শরীরে
উড়িয়েছি ক্লান্তিমুখরতার একদল মাছি..
নেমেসিস, দীর্ঘশ্বাসের ওম হয়ে জড়িয়ে আমি
তোমার চেয়েও দামি এক তুমিহীন পথের ছায়ায়
দাঁড়িয়েছি আজ...

ক্লেদাত্মার গান

বিশ্বাস শব্দটিকে একটি মৃত নদীর সাথে
তুলনা করে করে ঘুমাতে যাই এবং জেগে উঠি।
অসংখ্য নারী-কোলাহলমুখর সন্ধ্যার বাতাসে
ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত আমার শিস ফিরে আসে আমারই ঠোঁটে।
সমুদ্রসম নিদ্রার বালু হাতড়ে যাদের পাই–
তাহারা পলাতক বাতাস, ঘুরিতেছে নিঃসাড় আত্মার কাছাকাছি।

নির্জল পৃথিবীর বয়োঃবৃদ্ধ ধুলোর সাথে আলাপচারিতা–
নাবিকের দীর্ঘশ্বাসের কাছে নতজানু লবণপাহাড়!
রেলপথ চলে গেছে নিয়ে এক বালকের বিষাদপুরাণ...

কেউ একজন ঢোকে

কেউ একজন ঢোকে
আর এলোমেলো করে যায় সবকিছু,
আমি তার পিছু নিতে যাই না কখনো–
এখনো চাবির গোছা আমার হাতে,
এখনো কাছাকাছি থাকা আর
কানামাছি কানামাছি খেলা।

চাবির দম্ভ নিয়ে বিকেলের ঘাসে
চাবির শক্তি নিয়ে সন্ধ্যার কাছে
আর দাবির গন্ধ নিয়ে অচেনা ভোরের
কাছে পড়ে থাকা কেউ আমি,
আমার ঠিকানা নেই– চাবি নিয়ে রোদে রোদে ঘুরি।

কেউ একজন ঢোকে আর শিস দিয়ে
গান গেয়ে হাসে, কী যায়-আসে তাতে?
উন্মীলনের মন্ত্র রয়ে গেছে আমার হাতে–
তবু প্রত্ন কুমন্ত্রণা আঁকে বসে বসে
ইরেজার ঘষে ঘষে মুছে দেয় রাতের চিঠি।

যদিও নদীর জলে রাতের উড়াল–
শিয়াল এক ডাকিতেছে, শ্মশানের সিঁড়ি ভেঙে
নামিতেছে এই বুকে প্রদাহের জল...

পানকৌড়ি

পানকৌড়ি দেখি নি কখনো,
আসলে উড়ে যেতে দেখি নি,
অথবা বসে থাকতে কোথাও,
আর ঘুমাতে তো নয়ই।
পানকৌড়ি কেন, কোনো পাখিকেই
আজ অবধি ঘুমিয়ে পড়তে দেখি নি,
আর তাই হয়তো পাখিদের জেগে
থাকার ঘটনা ঘণ্টা বাজায় নি চোখে, কোনওদিন..
পাখিরা ঘুমজেগে কী করে? অথবা
ঘুমিয়ে পড়ার আগে তারা মগ্ন
হয়েছে কি কখনো কোন আত্মমৈথুনে?
সঙ্গীমৃত্যুর সন্তাপে পাখিদের পশমী বুক
কতোটা কেঁপে ওঠে বা আদৌ কেঁপে ওঠে কি না অথবা নিজস্ব
কোন মুদ্রার পিঠ উল্টে
স্থির হয়েছে পাখিসভ্যতা–
এসব জানতে আমার খুব যে ইচ্ছে হয় তাও না,
অনিচ্ছার পাতলুন জড়িয়ে ঘুমিয়েপড়াকেই
সর্বোচ্চ সৌন্দর্যের মুকুট পড়িয়েছি আমি।

অথচ অক্ষরস্থাপত্যে
তোমার চিঠির ভেতর ঘুমিয়ে থাকা
এক পানকৌড়ি আজ আলস্যের ঠোকরে
কতোকিছু জানিয়ে গেল আমায়!

বৃত্তার্পণ

পেরেকটা ঢুকে যাচ্ছে দেয়ালের ভিতর।
আঘাতকারী তৃতীয়পক্ষ আমি,
পঞ্জিকা হাতে দাঁড়িয়ে আছি চেয়ারের উপর।
আরো অনেক কিছুর উপরই দাঁড়িয়ে ছিলাম আমি।
ব্যস্ত প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে দেখেছি
মানুষগুলো ঢুকে যাচ্ছে ট্রেনের ভিতর।
এমন অজস্র উদাহরণকে কবিতায়
ঢুকিয়ে দিয়ে শেষতক কোথায়
গিয়ে দাঁড়াতে পারবো আমি?

পেরেকটা ঢুকে গেছে দেয়ালের ভিতর,
ঝুলে থাকা পঞ্জিকায় ঢুকে যাচ্ছে
মানুষের নিরীহ বয়সগুলো।

অস্পৃশ্য ঘ্রাণ

কে তুমি জানি নি আজো,
তবু তোমার অস্পৃশ্য উপস্থিতি ভালো লাগে।
মনে হয় কাঁচা তালের পাতার বাতাসের মতো
সবুজ তোমার ঘ্রাণ...
মনে হয় গ্রামের ভিতর
জ্বরের মতো ঘোর নিয়ে কোলাহলে,
কুঞ্জমেলার পুতুল-সন্দেশ হাতে লজ্জিত দাঁড়িয়ে তুমি।
তোমার অধরে মধু আর
কেঁদে ফেলা চোখের মর্মে
মেলায় হারিয়ে ফেলা আমার নাম...
তবু মনে হয় এসকল কিছু নয়–
নয় প্রাপ্তি বা হারানোর ঘটনা,
নির্বিকার চেয়ে থাকার চেয়ে সুন্দর কিছু নেই।
আলস্যের সৌন্দর্যে প্রজ্জ্বলিত একটি জীবন
কতোটুকু আঁধার দাবি করে?
সেই পুরনো কুঞ্জমেলা. পুতুল-সন্দেশ হাতে নিয়ে
দাঁড়িয়ে থাকা কাঁচা তালপাতার সবুজ গন্ধমুখর
মেয়েটিকে মনে হয় প্রলাপের সন্তান–
ভ্রান্তিমুখর কোলাহল নিয়ে
অদৃশ্য নেচে বেড়ায় নীরব অস্তিত্বের গোপন উঠোনে...

কাঠপেন্সিল

এই ধ্বংসস্তূপ থেকে
আমি একটি কাঠপেন্সিল কুড়িয়ে নিই;
এক টুকরো কাগজ।
দস্তখত দিয়ে আমি
পৃথিবীর সমাপ্তি ঘোষণা করি...

আত্মনিমগ্ন গান - ১

আমি নদীটির কথা বলতে চাই না
বলতে চাই না কাশফুল, কলমিফুল
আর শাপলার উপাখ্যান...
কখনো ফেরা হবে না নিজের কাছে
এই জেনে তোর কাছে এর কাছে-ওর কাছে
ফিরতে চেয়েছি বহুবার–
আমি বলতে চাই না আমার ফেরার কথা
অথবা না-ফেরার স্মৃতি নিয়ে
বুনতে চাই না কোনো রহস্যগাথা।

আমি নদীটির কথা বলতে চাই না
এই কথা নদীটিরও জানা আছে–
আমার কাছে তবু তার নিত্য বেলেল্লাপনা...
কাশফুল আর কলমিফুল আর শাপলারা
আবিষ্কার করেছিলো আমার ঠিকানা–
প্রত্যাখ্যানের স্বাদ নিয়ে আজ তারা ফুটে আছে,
যেমন চুম্বনের স্বাদ নিয়ে ফুটে উঠেছিলো
তোর স্তন– সেই রাতে, বারান্দার টবে
যখন মরে যাচ্ছিলো বিষণ্ন টিউলিপেরা...

বিড়ালগুলোর সাথে

বিড়ালগুলোর সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই- ওরা আষ্টেপৃষ্ঠে আগন্তুক- এ কথা বলি না। রেলের চাকায় দু'টুকরো হয়ে পড়ে থাকা গর্ভবতী এক বিড়ালকে আমি মাটিবন্দি করে রেখেছিলাম আর নির্মীয়মাণ এপিটাফের খোঁজ খবর প্রতিদিনই নিয়ে আসি দোকান থেকে- সামগ্রিক বিষয়টিকে স্বীকারোক্তির চাদরে জড়িয়ে দিলে আমাকে জিরো পয়েন্ট করে ঘুরতে থাকা বিড়ালেরা দৃশ্যমান হন।

নীরবতাকামী মন প্রতিবাদী হলে বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধার দায়িত্ব নেয় সহোদর বিড়ালের দল, উন্মুক্ত সাদা কাগজে এসে পড়ে ধ্বনির তরল- ভেজা পৃষ্ঠা মুখে চেপে ধরলে আমার স্ত্রী ঈর্ষান্বিত চোখ মেলে রাখে- ঈর্ষার ভিতর গড়িয়ে যায় মূত্র, লালা আর বমির স্রোত।

ওয়েটিংরুমের দরজায়ও কিছু বিড়াল ওঁত পাতে- দুর্বোধ্য ভাষায় হয়তো মাটিবন্দি বিড়ালের শোকে মাতে তারা- আমার অপেক্ষমাণ মনের ভিতর এসে পড়ে বিড়ালের হলুদাভ মূত্রধারা।

অরণ্যযাত্রা

অরণ্যের নির্জনতায়
মুখর হয়ে ওঠো প্রাণ,
শোনো গান ওই পাখির–
বাকি থাক এই লোকালয়
বিড়ালের বিশ্রামালয় আর
প্রজনন বিদ্যালয়ের রণকৌশল–
সদল সবুজের ঘনত্বে
জীবন মাখো, রাখো হাত এই
ঘাসের ডগার মাথায়–
কাঁথায় জড়ানো ঘুম ছেড়ে
স্ত্রীলোকের ওম নেড়ে দেখা ঠোঁটে
লাগাও কুয়াশার জল–
বলো চিতার সাথে কথা,
শোনো সঙ্গীনি হত্যায় বোনা
শোকগাথা তার, আর–
বারবার চাঁদের পতনে লেখা
একা এক বাঘের গল্প শুনি এসো,
এসো ভুলে যাই–
দুলে যাই এক অস্পষ্ট আলোর রেখায়,
দেখায় যে তার থেকে দৃশ্য করি চুরি...

জ্বরের প্রলাপ - ১

এ কেমন জ্বরে আজ
কেঁপেছে শরীর?
পুড়ে গেছে দ্বিধারণ্যের বৃক্ষ,
সাথে নিয়ে কামহীন ঘাম-ঘাম রাত–
নাচের মশাল জ্বেলে
চুমুরা নেমেছে আজ
ঠোঁটের আলে,
কে যেন শোনায় গান
স্বপ্নের অভিধান খুলে খুলে,
ক্লান্ত দু'হাত
তুলে কে কারে বলেছে আজ
এসো যাই–
ঝরাই রাতের নোনা ঘাম,
কেমন জ্বরের তানে
বিস্মরণের পানে
হেঁটে হেঁটে ভুলেছি সে নাম?

জ্বরের প্রলাপ - ২

রাত আর ঘড়ির বিচ্ছেদ শুরু হতেই থার্মোমিটারগুলো সাড়া দিয়ে ওঠে। পাল্লা দিয়ে এগিয়ে যায় পারদের কাঁটা। পুনঃপ্রচার গিলে খায় আঁধার-পর্দার ভাঁজগুলো- সবগুলো ভাঁজ। ব্যবহৃত জলপট্টি থেকে নেমে আসে বিষাদ-উত্তাপ, ভাঙা ফটোফ্রেম আর সমৃদ্ধ পাপ-আয়নায় প্রতিবিম্বিত মুখাবয়ব। নাপা'র খালি প্যাকেট পঞ্জিকা হয়ে মৃদু-মৃদু ভাসে ঘরময়। ক্ষয়িষ্ণু চোখে মেয়াদ-নির্ভর সৃষ্টির উড়ন্ত পতাকা দেখে দেখে আমিও নিজস্ব মেয়াদ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে প্রেমিকার সাথে উদ্বিগ্ন হই- প্রেমের মেয়াদ যেন ফুরিয়েছে কবে? নেই, মনে নেই, মনে নেই নেই নেই। সেই হাত এই রাত; মাঝে তার ঢুকে গেছে জ্বর। থার্মোমিটারে আজ নেই কোনো পারদ- পারদেরা পলায়নপর।

ঈর্ষাক্রান্ত দ্বিধা

ঈর্ষার কাঁটাতার পেরুবার জন্য
উন্মুখ হয়ে আছে প্রেম
রাতের ইথারে শুধু ঝুলে থাকে
আজকাল সংশয়গুচ্ছের হেম।
আমাদের ডাকনাম 'দ্বিধা'– দেখো
ডাকনামে ডাকাডাকি যতো
অথচ তোমার বুকে আজো দেখি
ফুটে আছে আমারই চোখের বোনা ক্ষত।
তবু যেন কোত্থেকে ভেসে আসে হুটহাট
অনাহূত বিজয়ীর হাসি
আমাকে তোমার আর তোমাকে আমার আর
হচ্ছেনা বলা 'ভালোবাসি'।

মহিলা ডাক্তার

১০৪ ডিগ্রি জ্বর নিয়ে ঢুকে পড়লাম এক মহিলা ডাক্তারের চেম্বারে। গাইনী ও প্রসূতি বিদ্যায় বিশেষ দক্ষ এই ডাক্তার আমার মুখে পুরে দেন থার্মোমিটার– তখনই আমার জ্বরাক্রান্ত– এলোমেলো– স্বাধিকার সচেতন ও নান্দনিক দাবি চিৎকার করে ওঠে– থার্মোমিটারের চাইতে স্তনের বোঁটার জ্বর পরিমাপ ক্ষমতা অনেক বেশি!

মাংসল থার্মোমিটার আমার জ্বর মাপতে থাকে– পারদ ছড়িয়ে পড়ে সারা শরীরে– বিগড়ে যাওয়া মটরকারের মতো শব্দ ভেসে ওঠে, শব্দ ভেসে ওঠে আর ফেঁসে যায় যান্ত্রিক কাঠামো– শীতাতপ চেম্বারময় হেসে বেড়ায় জ্বরের উত্তাপ।

মহিলা ডাক্তার এখন ১০৪ ডিগ্রি জ্বর নিয়ে করুণ পড়ে আছে কাচ-ঘেরা ঘরটার এক কোণে, উন্মত্ত থার্মোমিটার নিয়ে এবার আমি তার দিকে ছুটি– বেড়ে যায় উত্তাপ, গাঢ় হয় শারীরিক ত্রুটি!

সুপর্ণা ঘুমিয়ে গেছে

সুপর্ণা,
ঘুমিয়ে পড়েছো তুমি এই মিথ্যে মায়ার আলোর বিছানায়,
তোমার ঘুমের পাশে পড়ে আছে বিস্তীর্ণ পথ...
তোমার শরীরের নোনাগন্ধে ক্রমশই লবণাক্ত রাতের অন্ধকারে
হারিয়ে যাওয়া কোনো আরব বেদুঈন আমি...
পাশ-ফেরা স্বপ্নের কিনার ঘেঁষে হেঁটে যাওয়া বিস্মিত চোখের
গহ্বরে অরণ্যের সবটুকু সবুজ লেপ্টে আছে...
সুপর্ণা,
তোমার দেহের বাঁকে জেগে আছে সহস্র জনপদ, চৌকিদারের
বাঁশির শব্দ আর উন্মত্ত ইঁদুরের দল...
তোমার ঘুমিয়ে পড়া মৃদু ঠোঁটের আলে গতকাল রাতের নির্ঘুম
দৃশ্যের ভিড়– তুমি ঘুমিয়ে পড়েছো...
দেখো, যাযাবরের পদধূলিঘূর্ণি তোমার অস্পৃশ্য চোখের ধূসরতায়
উড়ে উড়ে ক্লান্ত হয়ে যায়, ফিরে আসে...
সুপর্ণা,
এতো এতো পৃথিবীর নিকষ কালোয় তৈরি মিথ্যে মায়ার আলোর
বিছানা তুমি পেতেছো বিস্মরণের মঠে...
তোমার ঘুমের পাশে জেগে আছে বিস্তীর্ণ পথ আর সেই পথ ধরে
হেঁটে যাওয়া আমি এক আরব বেদুঈন...
ফিরে আসি, ফিরে যাই– অলীক পাহারাক্রান্ত পায়চারির মাঝপথ
ভেদ করে উড়ে যায় নিশাচর পাখি...

মালিহা জেরিনের একটা রঙজ্বলা ছবির দিকে তাকিয়ে

ছবিটার কাছে আর পাতবো না হাত
যতো খুশি ক্ষয়ে যাক নিকোটিন রাত।

কনকগ্রামের ভোর তোর কানে বলেছিল
স্বপ্নের দাগ-লাগা ঘোর আর আকুলতা মেখে,
দেখে নিস একদিন তুই আর আমি মিলে
তিলে তিলে ক্ষয়ে যাবো– রয়ে যাবো তবু ঐ
হইচই দুপুরের–
ওপারের অশান্ত নীলে।

ছবিটার ঠোঁটে আর রাখবো না গাল
যতো খুশি ফুটে থাক রক্তাভ লাল।

ঘোড়াশাল থেকে যাক, বাঁক নেয়া রেল আর
শ্মশানঘাটের মাঠে একা– শেখা ডাক ডেকে যাক
কর্ণফুলি ট্রেইন– পেইন কিলারের ঘ্রাণ জুড়ে থাক
তোর ভোর, সকাল আর সন্ধ্যার গায়ে– পায়ে পায়ে
কাছে এসে বিস্মরণের গান তুলুক মন ভোলানো সুর–
দূর থেকে দেখ চেয়ে– পেয়ে হারানোর শোকে–
তোকে ভেবে কান্নার জল– দল বেঁধে নেমে আসে
স্বপ্নের আশেপাশে– এমনই অবাক চলাচল।

তবুও কেন যে ছাই– যাই শুধু বারবার রঙজ্বলা ছবিটার কাছে
বুঝিনা এমন কেন– অশান্ত নীল শুধু আমার কাছেই পড়ে আছে।
ছবিটার পাশে তবু কেটে যায় সবক'টা দিন
বলে যায় একটানা ফিরে আয় ফিরে আয়
ফিরে আয় মালিহা জেরিন।